আত্মজা'র - মুখপত্র

আত্ম-কথা

atmaja

৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

এক

এসো মিলি এসো মুক্ত অঙ্গনে

আত্মজা'র আজ, কাল, পরশু

গত ২১শে মার্চ আত্মজার বেশ কিছু সদস্য পরিবার বেড়িয়ে এলেন টাকা তৈরীর দেশ শালবনীতে।

এবার রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে ২৪শে মে ডঃ অমিতাভ রায় ও ডঃ শর্মিষ্ঠা রায়ের বাড়ীতে।

এই গরমের ছুটিতেই ছোটদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। সমস্ত সদস্যদের সাথে আমরা কিছু দিনের মধ্যেই এই ব্যাপারে যোগাযোগ করব।

সম্পাদকের কথা

অনেকেই প্রশ্ন করেন 'আত্ম-কথা' এত অনিয়মিত কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে পুরোপুরি নেই। আপনাদের হাতেই রয়েছে এর সমাধান। আরো বেশী করে লেখা, কবিতা, ছবি যদি আমাদের হাতে সময়মত এসে যায় তবেই মনে হয় আমরা একে নিয়মিত ভাবে বার করতে পারব।

ইচ্ছা ছিল শালবনীতে দোল কাটিয়ে আসার পরেই বসন্ত সংখ্যা হিসাবে এইবার আত্ম-কথা বের হবে। হ'ল না। চলে গেল রবীন্দ্র জয়ন্তী - সামনেই নজরুল জয়ন্তী। অন্য কিছু ভেবে না পেয়ে এই সংখ্যাটির নাম দিলাম - শালবনী সংখ্যা

স্বপন নস্কর

এবার পিকনিক হবে নরেন্দ্রপুর অথবা রাজপুরের বাগান বাড়ীতে ডিসেম্বর মাসের শেষে। আয়োজন করছেন শংকর নস্কর, স্বপন নস্কর এবং সঞ্জয় শিকদার। যোগোযোগ করুন নভেম্বরের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঃ তাঁর পিতৃসত্তা

- প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও প্রথম সন্তান হলেন মাধুরীলতা - যাঁর আবার ডাক নাম ছিল বেলা। ১৮৮৬ সালের ২৫ শে অক্টোবর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর জন্ম -ফরসা রঙ, অপরূপ সুন্দর চেহারাখান। এই মেয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, যত্ন আর আদরের অন্ত ছিল না। ছোট্ট বেলাকে নিয়ে তিনি সপরিবারে বেড়াতে গেছেন দার্জিলিং, বিজপুর, গাজিপুর, কখনও বা বোলপুর। তখন কবি নিজের হাতে শিশুকন্যা পরিচর্যা করতেন- কখনও বা দুধ খাইয়েছেন, আবার স্নান করিয়ে দিয়েছেন আদরের ছোট্ট মেয়েকে। যখন কবি একা ইংল্যান্ড রওনা হলেন। তখন মেয়ের চিন্তায় কাতর পিতা রবীন্দ্রনাথ। জাহাজ থেকে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিতে তাঁর পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার প্রকাশ দেখতে পাই। জাহাজে যাওয়ার সময় ছোট্ট বাচ্চা দেখলেই কবির নিজের বাচ্চাদের কথা মনে পড়ত।

এডেন পৌঁছাবার আগের দিন কবি লিখছেন ঃ "কাল রাত্রিরে 'বেলিটাকে' স্বপ্ন দেখেছিলুম - সে যেন স্টিমারে এসেছে তাকে তখন চমৎকার ভাল দেখাচ্ছে সে আর কি বলব"।

এই চিঠি লেখার ঠিক সাতদিন পরেই (৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০) 'ম্যাসলিয়া' জাহাজ থেকে লিখেছেন ঃ "বেলির জন্য আমি একটা কাপড় আর পাড় কিনে মেজ-বৌঠানদের সঙ্গে পাঠিয়েছি- সেটা এতদিনে অবিশ্যি পেয়েছ - খুব টুকটুকে লাল কাপড় - বোধ হয় বেলিবুড়িকে তাতে বেশ মানাবে - পাড়টাও বেশ নতুন রকমের না? মেজবৌঠানও বেলির জন্য তার একটা প্রাইজের কাপড় নিয়েছেন - নীলেতে শাদাতে - সেটাও বেলুরানুকে মানাবে, সেটা যে রকমের ভাবুন, নতুন কাপড় পেয়ে বোধ হয় খুব বেশি খুশী হয়েছে"।

বিলেত থেকে ফেরার কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের বলিগ্রাম জমিদারির কাজকর্ম দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে চার বছরের শিশুকন্যার চিঠি পেয়ে পত্নীকে লিখেছেন ঃ "আমার মিষ্টি বেলুরানুর চিঠি পেয়ে তখনি বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। আমার জন্যে তার আবার মন কেমন করে তার তো ঐ একটুখানি মন, তার আবার কি হবে? তাকে বোলো আমি তার জন্য অনেক 'অড' জ্যাম নিয়ে যাব।

প্রকৃতপক্ষে সন্তানদের মধ্যে মাধুরীলতার ভাগ্যেই রবীন্দ্রনাথের স্নেহ জুটেছিল সবচেয়ে বেশী, হয়তো সেটাই স্বাভাবিক। মাধুরীলতার ভাই রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন ঃ "আর সব ছেলেমেয়েদের চেয়ে দিদিকে বেশী ভালবাসতেন"। মাধুরীলতার মনটা ছিল বড় দয়ালু। আর তাঁর এই স্নেহময় স্বভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে 'কাবুলীওয়ালা' গল্পের 'মিনি'র। সেকথা স্বীকার করেই কবি হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছেন ঃ

"মিনি আমার বড়ো মেয়ের আদর্শে রচিত"।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের পিতৃস্নেহ মেয়েকে আদর ভালবাসার মধ্যে দিয়েই উজাড় হয়ে যায়নি - মেয়েকে সুশিক্ষিতা করে তোলার জন্য বাড়িতে শিক্ষক-শিক্ষিকা রেখেই লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

তাই একথা সহজেই বলা যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একধারে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতস্রষ্টা -চিত্রকর এবং একজন সার্থক পিতাও বটে।

ছুটির নিমন্ত্রণে

- তাপস চক্রবর্তী, শালবনী

আমাদের দোলের ছুটির নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁরা এলেন। বৃহস্পতিবার। ২০ মার্চ। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। আমি, রাকেশ, দীপঙ্কর আর পার্থ শালবনী স্টেশনে উপস্থিত তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে। বিকেল থেকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। তারই মধ্যে প্রায়ান্ধকার শালবনী স্টেশনে যখন পুরুলিয়া এক্সপ্রেস থেকে তাঁরা নামলেন, স্টেশনের রূপটাই সহসা বদলে গেল। এক ঝাঁক পরিযায়ী পাখীর মত ঝকঝকে সপ্রতিভ ভ্রমনপিপাসু বাঙালীর একটা দল। সেই দলে সদ্য ফোটা শিমুলের মতোই একগুচ্ছ প্রাণবন্ত কচিকাঁচা। তাদের আগমণে নিস্প্রভ স্টেশন চত্বরটা যেন আলোর রোশনাই তে ভ'রে উঠলো এক লহমায়।

প্রাথমিক সৌজন্য এবং আলাপচারিতার পর্ব সেরে তাঁদের নিয়ে আসা হল আমাদের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রণ উপনগরীর বন্ধু ভবনে। সেখানে তাদের থাকার বন্দোবস্ত। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ'হলে আপাত ভ্রমণ-ক্লান্তি নিবারণে তাঁদের সুখনিদ্রায় পাঠিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

আমাদের এই অতিথিরা আত্মজা নামে একটি সংস্থার সদস্যবৃন্দ। আত্মার গভীরে লালিত এক স্পর্শকাতর বোধ থেকে এই সংস্থার আর্বিভাব। তাই নাম আত্মজা। এঁদের অমায়িক নির্ভেজাল বন্ধুত্বের পরশে আমাদের সাথেও রচিত হয়ে গেল তাঁদের আত্মার আত্মীয়তা।

পরের দিন সকালে স্থির করা ছিলে প্রেসভিজিট। নোট মুদ্রণের চাক্ষুস দর্শন তাঁদের কাছে নিঃসন্দেহে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। যে উপলব্ধি সকলেই ব্যক্ত করলেন। এরপরে তাঁরা ঘুরে ফিরে দেখলেন টাউনশিপটা। আমাদের এই টাউনশিপটা প্রত্যন্ত গ্রামের মাঝখোনে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দে। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রেখে তাতে দেওয়া হয়েছে আধুনিকতার রূপসজ্জা। বকুল, শিমুল, পলাশ, কদম - অথবা কোথাও বা আকাশমনীর সারি। এখানে সারাদিন গাছে গাছে হরেক রকম পাখীর কলকাকলী এবং খুনসুটি। শিমূলের নু-উচ্চ শাখায় সারি সারি মৌচাক। ফ্লাওয়ার নাসারীতে মরসুমী ফুলের বাহার। আশাকরি আমাদের বন্ধুদের ভালো লেগেছে প্রকৃতির এই নিবিড় স্পর্শ।

সন্ধ্যায় আত্মজার পরিবারবর্গ যখন পরিমল উদ্যাস ঘুরে এলেন তখন বন্ধুভবন সংলগ্ন খোলা মাঠেদোল উপলক্ষ্যে চলছিল শিশুশিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান। সঙ্গে ছিল বহ্নিমালা এবং আতসবাজীর প্রদর্শনী। সেই উৎসবের আমেজ নিয়ে আমরা বসলাম বৈঠকী আড্ডায়। তখন বালকনীতে এসে পড়েছে জ্যোৎস্নার ঢেউ। আত্মজার আড্ডা - আর গান কবিতার পাঠ। কেটে গেলো হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া এক অনাবিল আড্ডার সন্ধ্যা।

পরদিন ছিল হোলীর ছুটি। বন্ধুভবনের সামনে আমরা সপরিবারে যোগ দিলাম আত্মজার হোলীর আনন্দে। নানান রঙের আবিরের মাধুরীতে একে অপরকে রাঙানো হল। বাচ্চারা জল রঙ ভরে লম্বা পিচকিরি দেগে সবাইকে স্নান করলো। সঙ্গে চললো আড্ডায় গানে হোলীর শুভেচ্ছা বিনিময়।

সারা বিকেল আমার স্ত্রী নিবেদিতা আর আমার ছোট বেলার বন্ধু শুভা আমাদের ফ্ল্যাটের ছাদে রঙিন আবিরের আলপনা দিল। হাত লাগানো তাহিতি, জন্টি এমনকি সৃষ্টিও। সন্ধ্যায় এই আলপনাকে ঘিরে পাতা আসনে বসল খোলা মেলা এক গানের আসর। পলাশ ফুলের সৌরভ সংবার হাতে তুলে দিয়ে অহিতিই সুচনা করলো সেই অনুষ্ঠানের। নীলাঞ্জনাদির নিপুন পরিচালনায় একে একে সবাই পরিবেশন করলেন কিছু গান কিছু কবিতা কিছু বা গল্প। বাচ্চারাও অংশ নিল তাতে। যে আমি গানের 'গ' জানি না তাকেও গাইতে হল ডুয়েট। সস্ত্রীক। গাইল মৌ- দি। 'তার গান শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল 'হৃদয়ের গান শিখে তো গায়কো সবাই/কজনা মৌ-এর মতো গাইতে জানে?" অঞ্জনদার মধুর ব্যাক্তিত্বের সঙ্গে ঠিকঠাক ম্যাচ করে তার গানের চয়ন। গাইল সোনালী। সে যে এত ভালো গান জানে সে কথা নাকি দীপঙ্কর জানতো না। কে জানে কজন সে কথা বিশ্বাস করল। গৌতমদার আবৃত্তি এ তো বড় রঙ্গ জাদু। পরিবেশনায় ছিল যথেষ্ট নাটকীয় মুন্সিয়ানা। সর্বোপরি উল্লেখ করতেই হয় স্বপনদা - শুভার অবিস্মরণীয় ডুয়েট। মালাবদলের (থুড়ি ফোন- বদলের) সেই প্রেমময় দৃশ্য শালবনীর প্রকৃতির ফ্রেমে বাঁধানো থাকলো। অবশেষে 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' কোরাসের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হল সন্ধ্যার আসর। তবে শেষ হয়েও হইলনা শেষ - এর মতো যার নাম না করলেই নয়। - তিনি হলেন আত্মজার বর্তমান কর্ণধার- 'অনুপদা'। অনুপদার অতুলনীয় রসবোধ - এবং নিপাট বন্ধুত্ব অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বৃক্ষ আপত্তিকে তুচ্ছ করে 'রাত পোহালো'। এল বিদায়ের বেলা। যেতে নাহি দিব- তবু যেতে দিতে হয়। লিখতে হয় একা একা নিবন্ধ। বার বার মনে হয় আত্মজার বন্ধুদের অমায়িক ব্যবহারের কথা। হয়ত অনেক অসুবিধা তাদের হয়েছে। কিন্তু সহাস্য সখ্যতার অঙ্গীকার

.....এরপর তিনের পাতায়

.....দুই পাতার পর

- এ তাঁরা সবটাই মানিয়ে নিয়েছেন। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এঁরা সবকলেই শিখরজয়ী। তবু সেই শিখর থেকে অনায়াসে নেমে আসতে পারেন তাঁরা। সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে নিখাদ আনন্দকে মিশিয়ে দিয়ে ভাগ করে নেন সবার সাথে। এ সত্যিই অতি উদার মননের পরিচয়বাহী। দুদিনের এই মেলবন্ধনে আত্মজার বন্ধুরা যে সুন্দর সময় আমাদের উপহার দিলেন তাতে আমরা গর্বিত।

রবিবার সকালে শালবনীর সীমানা ছাড়িয়ে আত্মজার বাসদুটি যখন মিলিয়ে গেল দুর হতে আরও দুরে - তখন মনের মধ্যে বাজ ছিল সেই কোরাসের রেশ -

রঙ যেন মোর মর্মে লাগে
আমার সকল কর্মে লাগে
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে
গভীর রাতের জাগায় লাগে
রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও
যাও গো এবার যাবার আগে

কবিতা

আনন্দ সুখ

- অনুপ দেওয়াজী

সংসারের ঝামেলাতে
মাথা বেশ গরম,
তখনই এসেছে সে
সুর করে নরম।

'বাবা' বলে ডাক দিয়ে,
ছোট কর হেসে,
বাহুদ্বয়ে গলা ধরে,
বড় ভালবেসে,

বলেছে সে, আজ তার
পড়া হল শেষ,
যদি খেলি ফুটবল
হয় তবে বেশ।

রাগ যায় জল হয়ে,
নেচে ওঠে মন;
কোলে তুলে, গাল ভরে
দিই চুম্বন

An Experience of Picnic Party

On 20th January '08 at winter season, our association had arranged a picnic party at Kyallani Simanta. We went by train and reached the picnic spot at 10.00 a.m. Soon we had our breakfast with luchi, vegetables made of potato and cauliflower & sweet. Then we the children started playing badminton, cricket and some puzzel games etc. Our mothers went to see the place nearby. Our fathers were engaged working together. Then we all were playing musical chair. We had our lunch at 2.00 p.m. with delicious rice, dal, fried potato, fish curry, mutton curry, chatni, papad, sweets & pan. The picnic spot was very beautiful. There were many trees. We enjoyed the charming sight scene. Then some chocolates were distributed among the children. At 4.30 p.m. we packed our bags and got ready for comming back to home. We enjoyed the day with great enjoyments.

From -
Anusha Basu Chowdhury

'শালবনীতে দোলের দিন' - ছবি তুলেছেন সঞ্জয় শিকদার

দেখে এলাম টাকা তৈরীর দেশ - শালবনী

- মৌসুমী বসু, সদস্যা, আত্মজা

জ্ঞান হওয়া থেকে শুনে এসেছি - অর্থই অনর্থের মূল। তাই যেদিন আত্মজার সভায় সিদ্ধান্ত হল আগামী ২০শে মার্চ সেই 'অর্থের সুতিকাগার' অর্থাৎ টাকা বানানোর দেশ 'শালবনী' তে যাওয়া হবে সেদিন সত্যিই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। ২০শে মার্চ বিকেল ৪-৪৫ মিনিটের পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে প্রচন্ড আনন্দ আর উত্তেজনা সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই রওনা হলাম শালবনীর উদ্দেশ্যে। হাসি, মজা, গান-বাজনা সঙ্গে চা, মুড়ি, বাদাম। দেখতে দেখতে প্রায় চার ঘন্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল। রাত ৮-৩০ মিনিটে লাল কাঁকর বিছানো ছোট্ট, একটা শান্ত স্টেশনে ট্রেনটা আমাদের নামিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার মিলিয়ে গেল। অন্ধকার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কোথায় কিভাবে যাবো ভাবতে না ভাবতেই অন্ধকার ফুড়ে 'রাকেশ' বেড়িয়ে এলেন। আমাদের গাইড। চললাম তাঁর সঙ্গে স্টেশনের বাইরে দুটো বাস। সুন্দর ফাঁকা রাস্তা ধরে বাস এগোলো। অন্ধকারের মধ্যেও জানলা দিয়ে বাইরে দেখার জন্যে উঁকিঝুকি। বিরাট একটা গেটের সামনে একসময় বাস দাঁড়ালো, গেটের মাথায় লেখা "ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক- নোট মুদ্রণ" শরীরটা শিরশির করে উঠল - এই টাকশাল।

সিকিউরিটি চেকিং এর পর বাস ঢুকলো ক্যাম্পাসের মধ্যে। একটু পরেই এসে দাঁড়ালাম ঠিক পিকচার পোষ্টকার্ডের মতো সুন্দর একটা দোতালা গেষ্ট হাউসের সামনে। চারদিকে শালগাছ, সাজানো বাগান, যতদুর চোখ যায় খোলা সবুজ মাঠ তার মাঝে আলো দিয়ে সাজানো এই মায়াবী গেষ্ট হাউস। ২১শে মার্চ সকালে ঘুম ভাঙলো। আগের রাতের বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির ওপর ' প্রথম আলোর চরণধ্বনি'। নিজের অজান্তেই কণ্ঠে উঠে এলো কবির বাণী। - 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বলে বলে'

এইবার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সময় টাঁকশাল দেখতে যাবো। আগে থেকে স্বপনদা আর পিয়া সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কয়েক মাইল এলাকা ঘেরা বিশাল এক কমপ্লেক্স-এর মধ্যে ঢুকলাম, ক্যামেরা আমাদের 'ফলো' করতে শুরু করলো। বিভিন্ন নিয়মকানুন পালন করে। সারা শরীরের তল্লাশি শেষ করে আমরা দোতালায় উঠে গেলাম।

আমাদের গাইড ছিলেন রাকেশ এবং তাপস তারাই আমাদের সব কিছু বুঝিয়ে দিলেন। ভারতে মোট চারটি জায়গায় টাঁকশাল আছে, শালবনী তার মধ্যে অন্যতম। এখানে শুধুমাত্র 'নোট' ছাপা হয়। যেখানে নোট ছাপা হচ্ছে সেখানটা সম্পূর্ণ কাঁচ দিয়ে ঘেরা, যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের প্রত্যেকের মাথার ওপর ক্যামেরা চলছে।

যে বিশাল কর্মযজ্ঞ এখানে চলছে তার বর্ণনা দেওয়া এককথায় অসম্ভব, নিজের চোখে না দেখলে এই অভিজ্ঞতার স্বাদ গ্রহণ করা যাবে না। যা দেখলাম তা জন্ম জন্মান্তরেও ভুলবো বলে মনে হয় না।

টাঁকশাল থেকে ফিরে চন্দ্রকোনা রোড-এ (পার্ক) গেলাম, এখানকার দোলনা, বোটিং, টয়ট্রেন খুবই উপভোগ্য। আমাদের এখানে যেদিন দোল সেদিন শালবনীতে বাজি পোড়ানো এবং ন্যাড়া পোড়ানো হয়। কমপ্লেক্স -এর বাসিন্দারাই ফ্রইসবের আয়োজন করেন, যার পোশাকি নাম 'হোলি যা উৎসব'।

পরদিন, অর্থাৎ ২২শে মার্চ এখানে দোল উৎসব। ছোট বড় সকলে মিলে রঙ খেলায় মেতে উঠলাম। কলকাতায় শেষ কবে এত সুন্দর রঙ খেলেছি মনে পড়ে না। রঙ খেলার শেষে বিকেলে বসন্ত উৎসব। শালবনীর একজনের বাড়ীর খোলা ছাদে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। আবীর, মিষ্টি আর ন্যাচ-গানে শান্ত শালবনী সেদিন আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছিল 'পিয়া'র গান সেদিনের অনুষ্ঠানে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। রাতের জমাট খাওয়া দিয়ে শেষ হল বসন্ত উৎসব।

২৩শে মার্চ রবিবার ভোরে আমাদের ট্রেন। গেটের কাছে বাস দাঁড়িয়ে, তার চারপাশে শালবনীর প্রিয় সমস্ত বন্ধুরা- আমাদের বিদায় জানাতে এসেছে। এত আতিথেয়তা, এত আন্তরিকতা! মনটা ভারী হয়ে গেল। বাস চলছে। আকাশ মেঘলা, বৃষ্টি পড়ছে। বাসের জানলা দিয়ে দুপাশের শালিগাছ, মাঠ পিছনে সরে যাচ্ছে। শুধু স্মৃতির ফ্রেমে বন্দী হয়ে যাচ্ছে বন্ধুদের মুখগুলো, আনন্দমুখর দোল উৎসব, নাচ-গান-আড্ডা। তবুও জানলার কাঁচটা এত ঝাপসা কেন? কাঁচটা ঝাপসা নাকি আমার চোখটা- ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পৃথিবীর কোন পথে; নরম ধানের গন্ধ-কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরির চাল-ধোয়া ভিজে হাত-শীত হাত খান,
কিশোরর পায়ে দলা মুথা ঘাস, লাল লালা বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা- এরি সাথে বাংলার প্রাণ;
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আসি পাই টের।

দি অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাডপ্টিভ পেরেনট্স,
আত্মজা ৫১৭ যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৬৮
থেকে নীলাঞ্জনা গুপ্ত এবং স্বপন নস্কর কর্তৃক প্রকাশিত
এবং সমস্ত স্বত্ব সংরক্ষিত।
ই-মেল ঃ atmaja_calcutta@yahoo.com